যুগান্তর

তারিখ ... 30 SEP 2015 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিকেলের প্রশ্ন ফাঁস অসুখ হলে সর্বনাশ

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার

বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য আছে এমন দেশগুলোর কোনো সূচক আছে কি-না জানি না। তবে যদি থাকত, তাহলে চোখ বুজে বলে দেয়া যেত, বাংলাদেশের অবস্থান ওই সূচকে থাকত সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কারণ, নানারকম বিভাজন এবং বিভিন্ন দুর্নীতি বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনকে নৈরাজ্যপূর্ণ করে রেখেছে। শিক্ষাঙ্গনে আজ সমস্যার পাহাড়। এসব সমস্যার মধ্যে শিক্ষা খাতে স্বল্প বাজেট বরাদ্দ, শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ ও দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতি ও সন্ত্রাস, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা, শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত বেতন, শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতার অভাব, গবেষণা ক্ষেত্রে স্বল্প বরাদ্দ, শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি, ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অত্যধিক মুনাফা অর্জন, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে সুশাসনের অভাব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল, সিট বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পদে পদে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ ভাঙা, ছাত্র ও শিক্ষকদের মান কমে যাওয়া, বাড়তি উপার্জনের জন্য শিক্ষকদের কোচিং করা ও অন্যত্র পাঠদান, ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল ফ্রড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতসব সমস্যার মধ্যে ঘন ঘন প্রশ্নপত্র ফাঁস সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি যে হাল আমলের সমস্যা, এমন নয়। বর্তমান সরকার বা মহাজোট সরকার আমলের আগেও এ সমস্যা ছিল। এরশাদ সরকারের সময় দশম বিসিএস পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ সমস্যা থাকলেও তা কয়েক বছর পরপর শোনা যেত। তবে মহাজোট আমল থেকে এ সমস্যাটি একটি নৈমিত্তিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘন ঘন ফাঁস হতে থাকে। এ ঘটনা শিক্ষাঙ্গনের পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা প্রায় সব প্রতিযোগিতামূলক কর্মকর্তা নিয়োগের পরীক্ষায়ও সংক্রমিত হয়।

মহাজোট আমলে এবং বর্তমান সরকারের সময় প্রতিবছর বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এর মধ্যে ছিল প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) থেকে শুরু করে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা, এইচএসসি, অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, ব্যাংক কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষা এবং বিসিএসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব পরীক্ষা। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের সদস্যরা এ সরকারের আমলে জমজমাট ব্যবসা করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর প্রতিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য গতানুগতিক ভঙ্গিমায় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা এক সময় চাপা পড়ে গেছে। সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের দ্রুততার সঙ্গে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে না পারায় প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা আশকারা পেয়ে আবারও এ বিনা পুঁজির লাভজনক 'ব্যবসায়' জড়িত হয়েছে।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে মহাজোট সরকার গঠিত হওয়ার পর ২০১০ সালে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এ প্রশ্ন ফাঁসকারী সিন্ডিকেট প্রতি চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা দরে প্রশ্ন বিক্রয় করে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে। রংপুর পুলিশ ওই সময় এ ঘটনায় জড়িত ১৬৭ জনকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ৬৮ লাখ টাকা উদ্ধার করেছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ২০১২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় ৩৩তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। বিসিএস প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা প্রশ্নপত্রের ৯টি বিষয়ের সেট পরীক্ষার্থীদের কাছে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা দরে বিক্রয় করে। এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের কিছু নেতা, কতিপয় বিজি প্রেস কর্মকর্তা এবং জনৈক পিএসসি কর্মকর্তা জড়িত ছিল বলে গোয়েন্দা সংস্থা সন্দেহ করেছিল। ২০১৩ সালের মে মাসে অগ্রণী ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে কর্তৃপক্ষ ওই পরীক্ষা বাতিল করে দেয়। একই বছর ডিসেম্বরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে বাতিল করা হয়। তবে ওই পরীক্ষা পুনরায় অনুষ্ঠানের সময় কোনো কোনো জেলায় আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।

২০১৩ সালের নভেম্বরে ফাঁস হয় জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্বীকার না করলেও যে প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তার সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া যায়। জেএসসিকে অনুসরণ করে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস করে চড়া দামে বিক্রি করা হয়। একই বছর এপ্রিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ফাঁসের ঘটনা স্বীকার করে এবং বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ৬০ জনকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীকালে ২০১৪ সালের এপ্রিলে ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও মাঝে মধ্যে ফাঁস হয়েছে। এ বছর ২০১৫ সালে হল মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁস।

এর আগে ২০১১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর ও শ্যামলী থেকে মেডিকেলের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে র‌্যাব ২১ জনকে গ্রেফতার করে মামলা করলেও তাদের একজনকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এই ২১ জনের একজন এ বছর মেডিকেল প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ১৫ সেপ্টেম্বর আবারও র‌্যাবের হাতে আটক হয়। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ এনে মামলা হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকলেও শাস্তির দৃষ্টান্ত নেই। গত ৬ বছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে ৭০টি মামলা হলেও এসব মামলায় কারও শাস্তি হয়নি। কাজেই প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা আশকারা পাবে এটাই স্বাভাবিক। এবার কোরবানির ঈদের ছুটি শেষ হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। জানি না ওই ভর্তি পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে কি-না। তবে গত দু'বছর বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল ফ্রডকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাওয়ায় এ বছর জরুরি ভিত্তিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ওই ভর্তি পরীক্ষাগুলোয় ডিজিটাল ফ্রড বাড়তে পারে।

এভাবে গত ৬-৭ বছরের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁস যেন ক্রমান্বয়ে একটি নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কোনো নিয়োগ বা ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে রেওয়াজ অনুযায়ী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং ধীরে ধীরে বিষয়টি একসময় স্তিমিত হয়ে যায়। অথবা, পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে একটি মামলা হয় এবং ওই মামলায় অভিযুক্তদের কাউকে শাস্তি দেয়ার মতো অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটাই যেন আজ নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী সিন্ডিকেটগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়নি। ফলে এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে বিনা পুঁজির এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী সিন্ডিকেটের অনেক সদস্যের নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না। অথচ এই পুলিশই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়া চোরদের ২-৩ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করতে পারে। আমাদের পুলিশ-র‌্যাবকে যথাযথ নির্দেশনা দিলে তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরতে পারবে না, এমনটা বিশ্বাস করা যায় না।

মেডিকেলের প্রশ্নপত্র যে ফাঁস হয়েছে, খতিয়ে দেখলেই এর সত্যতা অনুধাবন করা যায়। যারা পরীক্ষার্থী তারাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ। তারা বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে বলেই আন্দোলনে নেমেছে। সরকারও খতিয়ে দেখলে হয়তো বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলে পরীক্ষা চলাকালে ইউজিসিতে অভিযান চালিয়ে র‌্যাব ৩ জনকে গ্রেফতার করত না। পরীক্ষার আগের দিন ১৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহাখালী থেকে ৪ জনকে আটক করত না। রংপুরে ৩ চিকিৎসকসহ ৭ জনকে আটক করত না। আদালত আটককৃতদের রিমান্ড মঞ্জুর করত না। পরীক্ষায় ২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী ৮০ থেকে ৯০-এর ঘরে নম্বর পেত না। টিআইবি এ পরীক্ষা বাতিল করতে বিবৃতি দিত না। ইতিমধ্যে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারী সাধারণ পরীক্ষার্থীরা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে। আন্দোলনকারীরা তো তাদের মেডিকেলে ভর্তি করে নিতে বলছে না, তারা স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় ফাঁসমুক্ত প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাইছে। এ দাবি অত্যন্ত ন্যায্য। ইতিমধ্যে, তাদের দাবির প্রতি বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য সদস্য এবং কিছু রাজনৈতিক দল সমর্থন দিয়েছে। আন্দোলনকারীরাও তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়ে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের উচিত এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনের মতো মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের রাজপথে নামতে বাধ্য করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যত রকম প্রশ্ন আজ পর্যন্ত ফাঁস হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল মেডিকেল ও ডেন্টালের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, মেডিকেল বাদে আর যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সেগুলো ক্ষতিকর নয়। তবে বিদেশে ওই সব শিক্ষার্থীই কেবল মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি হতে পারে, যারা স্কুল ফাইনালে সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়। অস্ট্রেলিয়ায় যাদের গড় নম্বর থাকে শতকরা ৯৮ বা ৯৯, তারাই কেবল মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যান্য উন্নত দেশেও মেডিকেলে ভর্তির ক্ষেত্রে এমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, যারা মেডিকেলে ভর্তি হবেন, তারাই ডাক্তার হয়ে মানুষের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করবেন। তাদের হাতেই নির্ভর করবে মানুষের জীবন। তারা যদি যোগ্য, দক্ষ না হন এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে না পারেন তাহলে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। বাংলাদেশে সরকারেরও উচিত মেডিকেলে ভর্তি বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ থাকলে ওই পরীক্ষা বাতিল করে শতকরা ১০০ ভাগ স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করে আবারও পরীক্ষা গ্রহণ করে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিকেল ও ডেন্টালে পড়ার জন্য নির্বাচিত করা উচিত নয়তো ফাঁস করা প্রশ্নে যারা উচ্চ নম্বর পেয়ে মেডিকেল বা ডেন্টালে পড়ে পরবর্তীকালে ডাক্তারি করবে, তারা যে মানুষ মারা ডাক্তার হবে সে কথা আগে থেকেই বলে দেয়া যায়। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের প্রশ্রয়দাতারাও কোনো না কোনো দিন অসুস্থ হবেন। তাদেরও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কাজেই আজ যদি কেউ এ প্রশ্ন ফাঁসকে প্রশ্রয় দেন, তাহলে একদিন বৃদ্ধ বয়সে হয়তো তাদেরই আজকের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পাস করা হাতুড়ে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার : *প্রধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com